ইউনিট ১৩

জীবের কৌষিক গঠন ও প্রকৃতি

ভূমিকা

যার জীবন আছে সে জীব। উদ্ভিদ ও প্রাণির জীবন আছে এজন্য উদ্ভিদ ও প্রাণি উভয়ই জীব। এসব উদ্ভিদ ও প্রাণি দিয়ে জীবজগৎ গঠিত। আর যাদের জীবন নেই তারা জড় জগতের অন্তর্ভুক্ত। এসব জীব ও জড়জগৎ নিয়ে গঠিত হয় প্রাকৃতিক পরিবেশ। এ বিশাল জীবজগৎ মানব জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

মাটি, পানি ও বাতাসে বসবাসকারী জীব জন্তুর কিছু সংখ্যককে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই, এরা আকারে বড়। এছাড়া অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীব আছে, এদেরকে আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। কেবলমাত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এদেরকে আমরা দেখতে পাই; তাই এদেরকে আণুবীক্ষণিক জীব বলে।

উদ্ভিদ ও প্রাণির মধ্যে যেমন অনেক মিল আছে তেমনি এদের মধ্যে অনেক অমিলও রয়েছে। তবে প্রতিটি জীব এক বা একাধিক কোষ দিয়ে গঠিত। কোষ হলো জীবদেহের গঠন ও কাজের একক। প্রতিটি জীব খাদ্যগ্রহণ করে, শ্বসন ক্রিয়া চালায়, রেচনকার্য চালায় অপ্রয়োজনীয় অংশ দেহ থেকে বের করে দেয় এবং পরিশেষে মৃত্যুবরণ করে।

প্রতিটি জীব এক বা একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত হলেও সকল কোষগুলো একই ধরনের কাজ করে না। কিছু সংখ্যক কোষ একত্রে একই ধরনের কাজ করলেও অন্য একগুচ্ছ কোষ অন্য কাজ করে। এভাবে একই প্রকারের একই কার্য সম্পন্নকারী কোষগুচ্ছকে টিস্যু বলে। এমনিভাবে টিস্যু থেকে সৃষ্ট হয় টিস্যুতন্ত্র, অঙ্গ, অঙ্গতন্ত্র এবং পরিশেষে পূর্ণাঙ্গ জীবদেহ।

পাঠ ১৩.১

জীব ও কোষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জীবের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করতে পারবেন;
- জীবের কৌষিক গঠন সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন।

জীবের সাধারণ বৈশিষ্ট্য

আমরা আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখতে পাই, তাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। গরু, ছাগল, কুকুর, বিড়াল ও গাছপালা ইত্যাদি যাদের জীবন আছে। অন্যদিকে ঘর, বাড়ি, বই-খাতা, কাঁচ, কলম ইত্যাদি যাদের জীবন নেই, তাই এদেরকে বলা হয় জড় পদার্থ।

প্রতিটি জীবের নিজস্ব কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এ বৈশিষ্ট্যগুলোকে জীবের প্রধান লক্ষণ বলা হয়। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর সাহায্যে জড় বস্তু হতে জীবিত বস্তুকে সহজে আলাদা করা যায়। জীবিত বস্তুর বৈশিষ্ট্যগুলো তাদের বিভিন্ন রকম কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। এ কাজগুলোর মাধ্যমে জীবজগতের সদস্যরা পরস্পরের সাহায্যে নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে। উদ্ভিদ ও প্রাণির মধ্যে ক্রিয়াকলাপের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও এদের মধ্যে কতকগুলো মৌলিক সামঞ্জস্য রয়েছে। নিচে জীবের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

শ্বসন : শ্বসন প্রক্রিয়ায় সজীব কোষের মধ্যকার জৈব খাদ্য সাধারণত বায়ুর অক্সিজেনের সাহায্যে জারিত হয়ে সরলতম অজৈব অণুতে পরিণত হয়। এর ফলে খাদ্যের মধ্যে অবস্থিত স্থিতিশক্তি গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এ শক্তি জীবের বিভিন্ন জৈবিক কাজে সহায়তা করে।

পুষ্টি : জীবনযাপনের জন্য সব রকমের জীব খাদ্য গ্রহণ করে। জীবদেহে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের জন্য শক্তির প্রয়োজন হয়। জীবদেহে শক্তির যোগান দেয় খাদ্য। শক্তি খাদ্যে স্থিতিশক্তি হিসেবে জমা থাকে। জীবন ধারনের জন্য তাই প্রতিটি জীবকে খাদ্য গ্রহণ করতে হয়।

রেচন : জীবদেহে প্রতিনিয়ত বিপাক ক্রিয়া চলে। বিপাকের ফলে দেহকোষ থেকে বর্জ্য পদার্থ অপসারিত হয়। কখনো কখনো উদ্ভিদ দেহের বর্জ্য পদার্থ অদ্রাব্য বস্তু হিসেবে উদ্ভিদ কোষে সঞ্চিত থাকে।

চলাচল : প্রাণিরা সহজেই একস্থান থেকে অন্যস্থানে চলাচল করতে পারে। উদ্ভিদ চলাচল করতে না পারলেও এক স্থান থেকে অন্যস্থানে শাখা প্রশাখা এবং ফল ও বীজের বিসরণ ঘটাতে পারে।

বৃদ্ধি : প্রতিটি জীবের দেহে কমবেশি বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। খাদ্য গ্রহণের ফলে দেহে শক্তি সঞ্চিত হয়, ফলে দেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। এ ধরনের বৃদ্ধিতে কোষের প্রোটোপ্লাজম প্রধান ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপনা : প্রতিটি জীব ঠান্ডা, তাপ, আলো, অন্ধকার, স্পর্শ ইত্যাদিতে সাড়া প্রদান করে।

বংশবৃদ্ধি : বংশধর রেখে যাওয়া প্রতিটি জীবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রজনন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি জীব তার অনুরূপ জীবের জন্ম দিয়ে বংশবৃদ্ধি ও বংশ রক্ষা করে।

জীবনচক্র : প্রতিটি জীব প্রথমে জন্মগ্রহণ করে, পরে বৃদ্ধি পায়, পরিপূর্ণ বয়সে বংশবিস্তার করে পরিশেষে মৃত্যুবরণ করে। প্রতিটি জীবের ক্ষেত্রে এ সমস্ত পর্যায়ক্রম পরিলক্ষিত হয়, একে জীবনচক্র বলে। সকল জীব একটি নির্দিষ্ট জীবনচক্র অতিক্রম করে।

জীবের কৌষিক গঠন

১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুক ছিপির কিছু অংশ কেটে তাঁর নিজের তৈরি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পর্যবেক্ষণকালে মৌচাকের ন্যায় অসংখ্য ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ দেখতে পান। তিনি এ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠকে সেল (Cell) বা কোষ নাম দেন। জীবদেহ অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ সমষ্টি দ্বারা গঠিত। জীবদেহের প্রাণবস্তু এ কোষের মধ্যে নিহিত আছে বলেই একে জীবকোষ বলা হয়। জীবদেহ সৃষ্টিকারী কোষগুলো জীবদেহের যাবতীয় কাজ, যথা– শ্বসন, পুষ্টি, রেচন, বৃদ্ধি, বংশ বিস্তার প্রভৃতি সম্পাদন করে থাকে। প্রতিটি জীবের শারীরবৃত্তিক কাজের জন্য যে শক্তির দরকার, তা তৈরি হয় কোষের ভেতর রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে। এজন্য কোষকে একটি ক্ষুদ্র কারখানা বলা হয়। শুধু জীবন ধারনের জন্য নয়, বংশ পরম্পরায় জীবের অস্তিত্ব রক্ষার দায়িত্ব পালন করে এ কোষ। তাই কোষই হচ্ছে জীবের গঠন ও কাজের একক। প্রকৃতপক্ষে জীবিত কোষপ্রাচীর দ্বারা আবৃত প্রোটোপ্লাজমকেই কোষ বলা হয়। অবস্থান ও কাজ অনুযায়ী জীবকোষ প্রধানত দুই প্রকার, যথা– দেহ কোষ ও জনন কোষ।

দেহ কোষ : যে সব কোষ দেহের বিভিন্ন অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র গঠন করে তাদেরকে দেহ কোষ বলে। যেমন– পেশী কোষ, জাইলেম কোষ ইত্যাদি।

জনন কোষ : জীবদেহের যে সব কোষগুলো জননকার্যে অংশগ্রহণ করে, তাদেরকে জনন কোষ বলে। জনন কোষ কেবলমাত্র যৌন জননক্ষম জীবে সৃষ্টি হয়। যেমন– শুক্রাণু, ডিম্বানু, পুস্পরেণু ইত্যাদি।

জনন কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা দেহকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার অর্ধেক, এজন্য জননকোষকে হ্যাপ্লয়েড (n) কোষ বলে।

দেহ কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা জননকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যার দ্বিগুণ, এজন্য দেহকোষকে ডিপ্লয়েড (2n) কোষ বলে।

সারসংক্ষেপ

- প্রতিটি জীবের নিজস্ব কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এ বৈশিষ্ট্যগুলোকে জীবের প্রধান লক্ষণ বলা হয়।
- জীবের সাধারণ লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্যগুলো হলো– শ্বসন, পুষ্টি, রেচন, চলাচল, বৃদ্ধি, উদ্দীপনা, বংশ বৃদ্ধি ইত্যাদি।
- জীবদেহের গঠন ও কাজের একককে কোষ বলে।
- অবস্থান ও কাজ অনুযায়ী কোষ দু'প্রকার। যথা– দেহ কোষ ও জনন কোষ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. জীবদেহের গঠন ও কাজের একক কি?

(ক) অঙ্গ (খ) কোষ (গ) অস্থি (ঘ) টিস্যু।

২. কোষ সর্বপ্রথম কে নামকরণ করেন কে কি বলে?

(ক) রবার্ট হুক (খ) রবার্ট কক্ (গ) অ্যারিস্টোটল (ঘ) লিনিয়াস।

৩. অবস্থান ও কাজ অনুসারে কোষ কত প্রকার?

(ক) চার প্রকার (খ) তিন প্রকার (গ) পাঁচ প্রকার (ঘ) দুই প্রকার।

৪. শুক্রাণু কোন ধরনের কোষ?

(ক) স্নায়ু কোষ (খ) অস্থি কোষ (গ) জনন কোষ (ঘ) রক্ত।

৫. দেহ কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যা কত?

(ক) 5f সংখ্যক (খ) 4f সংখ্যক (গ) 3f সংখ্যক (ঘ) 2f সংখ্যক।

পাঠ ১৩.২

কোষের বিভিন্ন অংশ ও তাদের কাজ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- একটি আদর্শ উদ্ভিদ কোষের বিভিন্ন অঙ্গের নাম উল্লেখ করতে পারবেন;
- কোষের বিভিন্ন অঙ্গের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিতে পারবেন;
- কোষের বিভিন্ন অঙ্গের কাজ উল্লেখ করতে পারবেন।

আকার ও আয়তনে অত্যন্ত ছোট হলেও গঠন ও কাজে প্রতিটি কোষ বেশ জটিল। প্রত্যেকটি জীবকোষে প্রধানত দুটি অংশ থাকে। যথা– বহিরাবরণ (কোষ প্রাচীর ও কোষ ঝিল্লী) এবং প্রোটোপ্লাজম।

নিম্নে জীবকোষের বিভিন্ন অঙ্গের গঠন বৈশিষ্ট্য ও কাজ আলোচনা করা হলো–

কোষ প্রাচীর ও কোষ ঝিল্লী

প্রাণহীন জড়বস্তু দ্বারা গঠিত উদ্ভিদ কোষের বহিরাবরণকে কোষ প্রাচীর বলে। এটি সেলুলোজ নামক রাসায়নিক উপাদান দিয়ে গঠিত। কোষ প্রাচীরে অনেক সময় ছোট ছোট ছিদ্র থাকে, যার সাহায্যে এক কোষ অন্য কোষের সাথে সংযোগ স্থাপন করে। প্রাণি কোষে কোনো কোষপ্রাচীর নেই।

কাজ : (i) কোষ প্রাচীর কোষের আকৃতি ঠিক রাখে।

(ii) বাইরের আঘাত থেকে ভিতরের সজীব বস্তুকে রক্ষা করে।

কোষ প্রাচীরের ভিতরে, এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ আবরণটিকে এবং প্রাণিকোষের বাইরের আবরণটিকে কোষ ঝিল্লী বলে। ইহা লিপোপ্রোটিন দ্বারা গঠিত।

কাজ : (i) এটি কোষীয় সকল বস্তুকে ঘিরে রাখে।

(ii) এর মধ্য দিয়ে বস্তুর স্থানান্তর, ব্যাপন নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয় হয়।

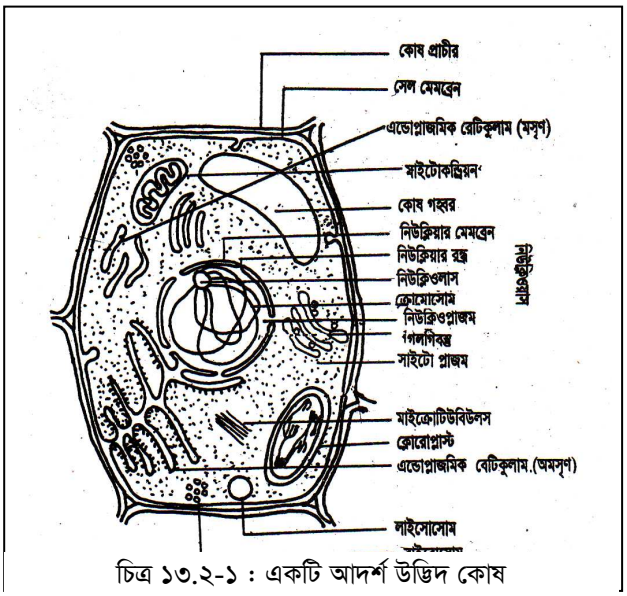

চিত্র ১৩.২-১ : একটি আদর্শ উদ্ভিদ কোষ

প্রোটোপ্লাজম

কোষ প্রাচীর এবং ঝিল্লী ব্যতীত কোষের অভ্যন্তরীণ যে স্বচ্ছ, ঘন ও জটিল জীবন্ত বস্তু দেখা যায়, তাকে প্রোটোপ্লাজম বলে। ইহাই জীবনের মূলসত্তা। আমরা প্রতিদিন যা কিছু খাই, যেমন– আমিষ, শ্বেতসার, স্নেহ পদার্থ, পানি, খনিজ পদার্থ, শক্তি সরবরাহকারী দ্রব্য (এ.টি.পি) প্রভৃতি এতে আছে। প্রোটোপ্লাজমে শতকরা ৭৫ থেকে ৯৫ ভাগ পানি থাকে। এটি সাধারণত গতিশীল এবং বংশবিস্তারে সক্ষম। প্রোটোপ্লাজমকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা– সাইটোপ্লাজম ও নিউক্লিয়াস।

কাজ : কোষের সমস্ত কাজ প্রোটোপ্লাজমে সম্পন্ন হয়।

সাইটোপ্লাজম

প্রোটোপ্লাজমের নিউক্লিয়াসকে বাদ দিলে যে স্বচ্ছ, ঘন ও তরল পদার্থ থাকে, তাকেই সাইটোপ্লাজম বলে। এটি প্রধানত আমিষ দিয়ে তৈরি। ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গাণু যেমন– মাইটোকন্ড্রিয়া, কোষগহ্বর, প্লাস্টিড (উদ্ভিদ কোষে), অন্তঃপ্লাজমীয় জালিকা, রাইবোজোম, সেন্ট্রিয়োল (প্রাণি কোষে), সেন্ট্রোজোম (প্রাণিকোষে), বর্জ্য দ্রব্যাদি দেখা যায়।

কাজ : (i) বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গ ধারণ করা;
(ii) কতিপয় জৈবিক কাজ করা।

মাইটোকন্ড্রিয়া

সাইটোপ্লাজমের মধ্যে ইসস্তত বিক্ষিপ্ত দন্ডাকার, তন্তুকার, বৃত্তাকার প্রভৃতি কতগুলো বিবিধ আকৃতি বিশিষ্ট যে বস্তু দেখতে পাওয়া যায়, তাদেরকে মাইটোকন্ড্রিয়া বলে। একটি কোষে মাইটোকন্ড্রিয়ার সংখ্যা প্রায় ৩০০–৮০০টি। মাইটোকন্ড্রিয়া দুটি আবরণী দিয়ে তৈরি। বাইরের আবরণটি মসৃণ কিন্তু ভিতরের আবরণটি স্থানে স্থানে ভাঁজ হয়ে ভিতরের দিকে ঝুলে থাকে, এ ভাঁজগুলোকে ক্রিস্টি বলে। মাইটোকন্ড্রিয়ায় প্রায় ৭৩% প্রোটিন, ২৫% লিপিড এবং ০.৫% RNA থাকে। মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরের অর্ধতরল দানাদার পদার্থকে ম্যাট্রিক্স বলে।

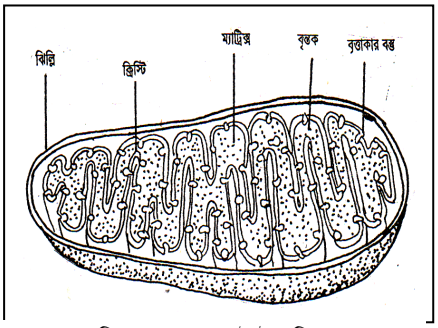

চিত্র ১৩.২-২ : মাইটোকন্ড্রিয়া

শ্বসনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল এনজাইম মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে থাকে, ফলে এগুলো শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে। এজন্য মাইটোকন্ড্রিয়াকে শক্তি উৎপাদনের উৎস (Power house) বলা হয়।

কাজ : শক্তি উৎপাদন করা।

কোষ গহ্বর

সাইটোপ্লাজমে একক পর্দা বেষ্টিত তরলে পূর্ণ গহ্বরকে কোষ গহ্বর বলে। উদ্ভিদকোষে সাধারণত বড় আকারের এবং প্রাণি কোষে সাধারণত ছোট আকারের কোষ গহ্বর দেখা যায়। কোষ গহ্বরে পানি, জৈব এসিড, শর্করা খনিজ লবণ ইত্যাদি জমা থাকে।

কাজ : কোষ রস ধারণ করা।

প্লাস্টিড

সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র, দানাদার বিভিন্ন আকারের বস্তু দেখতে পাওয়া যায়, তাদেরকে প্লাস্টিড বলে। প্লাস্টিড উদ্ভিদ কোষের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য। এর উপস্থিতির কারণে উদ্ভিদের পাতা, ফুল ও ফলের বর্ণ বৈচিত্র্য দেখা যায়। উদ্ভিদ কোষে সাধারণত তিন প্রকার প্লাস্টিড থাকে। যথা– ক্রোমোপ্লাস্ট, ক্লোরোপ্লাস্ট ও লিউকোপ্লাস্ট।

ক্রোমোপ্লাস্ট

সবুজ ছাড়া অন্যান্য বর্ণ (লাল, হলুদ) বহনকারী প্লাস্টিডকে ক্রোমোপ্লাস্ট বলে। ক্রোমোপ্লাস্টে ক্যারোটিন ও জ্যান্থোফিল বেশি পরিমাণে থাকে এবং ক্লোরোফিল অল্প পরিমাণে থাকে। ফুলের পাপড়িতে ও ফলে ক্রোমোপ্লাস্ট থাকে। এজন্য ফুল ও ফল বিভিন্ন বর্ণের দেখায়। ফুলের বিভিন্ন বর্ণের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে প্রজাপতি ও পাখি পরাগায়নে ও বংশবিস্তারে সাহায্য করে।

ক্লোরোপ্লাস্ট

ক্লোরোপ্লাস্টে ক্লোরোফিল নামক সবুজ বর্ণ কণিকা থাকে। এজন্য পাতা ও শাখা প্রশাখা সবুজ দেখায়। ক্লোরোপ্লাস্টে, ক্লোরোফিল ব্যতীত অন্যান্য বর্ণ কণিকাও অল্প পরিমাণে থাকে, যেমন– হলুদ বর্ণ কণিকা জ্যান্থোফিল ও কমলা বর্ণ কণিকা ক্যারোটিন। ক্লোরোপ্লাস্ট

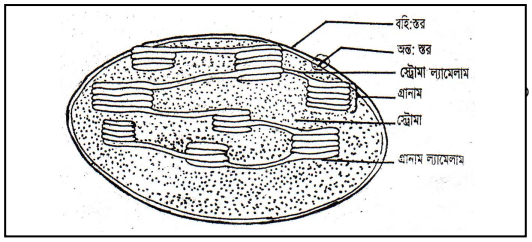

বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে, তবে বড় বড় উদ্ভিদে সাধারণত লেন্স আকৃতির হয়।

লিউকোপ্লাস্ট

বর্ণহীন প্লাস্টিড হচ্ছে লিউকোপ্লাস্ট। মাটির নিচের অংশ, তথা রাইজোম, কর্ম, মূল প্রভৃতিতে লিউকোপ্লাস্ট থাকে। এটি খাদ্য সঞ্চয় করে রাখে।

চিত্র ১৩.২-৩ : ক্লোরোপ্লাস্টের বিভিন্ন অংশ

কাজ : (i) সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করা।
(ii) ক্লোরোপ্লাস্টের প্রয়োজনে প্রোটিন, নিউক্লিক এসিড তৈরি করা।

নিউক্লিয়াস

প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে অধিকতর ঘন, অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছ, পাতলা ঝিল্লী দ্বারা পরিবেষ্টিত গোলাকৃতি অঙ্গানুকে নিউক্লিয়াস বলে। নিউক্লিয়াস কোষের সকল জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। নিউক্লিয়াস আবার চারটি অংশ দ্বারা গঠিত হয়। যথা–

নিউক্লিয়ার আবরণী

নিউক্লিয়াস একটি সূক্ষ্ম সজীব আবরণী দিয়ে সাইটোপ্লাজম থেকে পৃথক থাকে। এ আবরণীকে নিউক্লিয়ার আবরণী বলে। নিউক্লিয়ার আবরণীতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, এদেরকে বলে নিউক্লিয়ার ছিদ্র, এর সাহায্যে নিউক্লিয়াস সাইটোপ্লাজমের সাথে সংযোগ স্থাপন করে।

নিউক্লিওপ্লাজম

নিউক্লিয়াসের মধ্যস্থ ঘন জেলির মত পদার্থকে নিউক্লিওপ্লাজম বলে।

ক্রোমোজোম

নিউক্লিওপ্লাজমের মধ্যে অবস্থিত সূক্ষ্ম সুতার ন্যায় লম্বা বা প্যাঁচানো বস্তুকে ক্রোমোজোম বলে। ডি.এন.এ এবং আমিষ জাতীয় পদার্থ সহযোগে ক্রোমোজোম গঠিত।

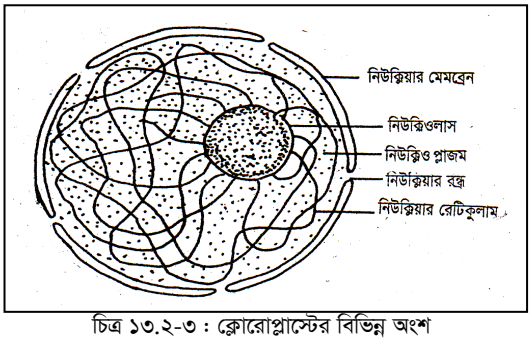

চিত্র ১৩.২-৩ : ক্লোরোপ্লাস্টের বিভিন্ন অংশ

কোনো নির্দিষ্ট জীবের প্রত্যেক কোষে সমান সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে। ক্রোমোজোমে জীন থাকে, যার মাধ্যমে মা-বাবার বৈশিষ্ট্য সন্তানদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। তাই ক্রোমোজোমকে বংশগতির ধারক ও বাহক বলা হয়।

নিউক্লিওলাস

নিউক্লিয়াসের মধ্যে উপস্থিত সর্বাপেক্ষা ঘন, গোলাকৃতি বস্তুকে নিউক্লিওলাস বলে। এটি আমিষ জাতীয় পদার্থ দিয়ে তৈরি বলে ধারণা করা হয়।

কাজ : নিউক্লিয়াস কোষের সমস্ত জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। নিউক্লিয়াস ছাড়া কোনো কোষ বাঁচতে পারে না, এজন্য, একে কোষের প্রাণকেন্দ্র বলা হয়।

সারসংক্ষেপ

- প্রতিটি জীবকোষে প্রধানত দুটি অংশ থাকে, যথা বহিরাবরণ ও প্রোটোপ্লাজম।
- কোষ প্রাচীর এবং ঝিল্লী ব্যতীত কোষের অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছ, ঘন ও জটিল জীবন্ত বস্তুকে প্রোটোপ্লাজম বলে।
- প্রোটোপ্লাজমে নিউক্লিয়াস ছাড়া যে স্বচ্ছ, ঘন ও তরল পদার্থ থাকে সেটাই সাইটোপ্লাজম।
- কোষের বিভিন্ন ক্ষুদ্রাঙ্গগুলো সাইটোপ্লাজমে অবস্থান করে।

- প্রোটোপ্লাজমের মধ্যে অধিকতর ঘন, অপেক্ষাকৃত অস্বচ্ছ, পাতলা ঝিল্লী দ্বারা পরিবেশিষ্টত গোলাকৃতি অঙ্গানুকে নিউক্লিয়াস বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোষের কোন অংশটি মৃত কোষ দ্বারা গঠিত?

(ক) প্রোটোপ্লাজম (খ) মাইটোকন্ড্রিয়া (গ) কোষ প্রাচীর (ঘ) কোষ আবরণী।

২. নিচের কোনটিকে জীবদেহের রাসায়নিক কারখানা বলা হয়?

(ক) প্লাস্টিড (খ) সাইটোপ্লাজম (গ) টিস্যু (ঘ) কোষ।

৩. নিচের কোনটিকে শক্তিঘর বলা হয়?

(ক) মাইটোকন্ড্রিয়া (খ) প্লাস্টিড (গ) নিউক্লিয়াস (ঘ) রাইবোজোম।

৪. কোন বর্ণ কণিকার জন্য ফুল ও ফল বিভিন্ন রঙের হয়?

(ক) ক্লোরোপ্লাস্ট (খ) ক্রোমোপ্লাস্ট (গ) লিউকোপ্লাস্ট (ঘ) অ্যামাইলোপ্লাস্ট।

৫. বংশগতির ধারক ও বাহক নিচের কোনটি?

(ক) প্লাস্টিড (খ) কোষ প্রাচীর (গ) মাইটোকন্ড্রিয়া (ঘ) ক্রোমোজোম।

পাঠ ১৩.৩

ক্রোমোজোম ও লিঙ্গ নির্ধারণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ক্রোমোজোমের সংজ্ঞা দিতে পারবেন;
- লিঙ্গ নির্ধারণে ক্রোমোজোমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ক্রোমোজোম

নিউক্লিয়াসের নিউক্লিওপ্লাজমের মধ্যে লম্বা সূক্ষ্ম সুতার ন্যায় যে বস্তুগুলো দেখা যায়, সেগুলোকে ক্রোমোজোম বলে। ক্রোমোজোম কোষের স্থায়ী অঙ্গ হলেও কেবলমাত্র একটি বিশেষ কোষ হতে অন্য কোষ সৃষ্টির সময় এদেরকে স্পষ্ট দেখা যায়। ক্রোমোজোম একই জীবের প্রত্যেকটি কোষে সমান সংখ্যক হিসেবে বিন্যস্ত থাকে। ক্রোমোজোমে অসংখ্য অতি সূক্ষ্ম জীন (Gene) বা বংশাণু বিন্যস্ত থাকে। এ সমস্ত বংশাণু তথা জীনের মাধ্যমে মা-বাবার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তথা, দেহের রং, আকার, আয়তন, লিঙ্গ ইত্যাদি সন্তান-সন্ততিতে স্থানান্তরিত হয়। মানুষের ক্রোমোজোমে অসংখ্য জীন বিন্যস্ত থাকে, এ কারণে অভিন্ন যমজ ব্যতীত কোনো দুটি মানুষ চেহারা, আকৃতি, প্রকৃতিতে একই রকম হয় না।

জীনের রাসায়নিক উপাদানকে বলা হয় ডিএনএ (DNA-Deoxyribonucleic acid)। এটি অতি জটিল ও তুলনামূলকভাবে বৃহদাকার অণু। প্রতিটি জীনে ডিএনএ অণুর বিন্যাস বিভিন্ন ধরনের। ফলে জীবদেহে এক একটি জীন এক-এক কার্য সম্পাদন করে থাকে।

প্রতিটি ক্রোমোজোম এক বা একাধিক সেন্ট্রোমিয়ার, একটি ক্রোমোনেমা বা একাধিক ক্রোমোনেমাটা দ্বারা গঠিত। কোনো কোনো ক্রোমোজোমে স্যাটেলাইট থাকে।

বিভিন্ন জীবকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা একই থাকে না। বয়ঃপ্রাপ্ত উন্নত জীবের প্রতিটি কোষে জোড়বদ্ধভাবে ক্রোমোজোম অবস্থান করে বলে এ সংখ্যাকে ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যক বলে। প্রাণির জননকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা কমে অর্ধেক বা একপ্রস্ত হয়ে যায়। জননকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যার এ অর্ধেক হ্রাস পাবার প্রক্রিয়াকে বিয়োজন-বিভাজন বা মিয়োসিস বলে। যেমন– মানুষের শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর ক্রোমোজোম সংখ্যা ২৩ অর্থাৎ শুক্রাণু ও ডিম্বানুতে একপ্রস্ত ক্রোমোজোম থাকে। তেমনিভাবে সপুষ্পক উদ্ভিদের পরাগরেণু ও ডিম্বানুতে এক প্রস্ত ক্রোমোজোম থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় কোষে এক ক্রোমোজোম থাকলে সে সংখ্যাকে হ্যাপ্লয়েড (n) বা অর্ধেক সংখ্যা বলে। ক্রোমোজোমের হ্যাপ্লয়েড সংখ্যাকে 'n' এবং ডিপ্লয়েড সংখ্যাকে '2n' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে ক্রোমোজোমের ভূমিকা

মানবদেহের প্রতিটি কোষে ২৩ জোড়া বা ৪৬ টি ক্রোমোজোম থাকে। এ ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে ২২ জোড়া ক্রোমোজোমকে বলা হয় অটোজোম। অটোজোম দেহের নানা প্রকার গঠন প্রণালী ও জৈবিক কাজ নিয়ন্ত্রণ করে, লিঙ্গ নির্ধারণে এদের কোনো ভূমিকা নেই। বাকী এক জোড়া ক্রোমোজোমকে বলা হয় সেক্স ক্রোমোজোম বা লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম। সন্তান ছেলে অথবা মেয়ে হবে তা নির্ধারণ করে লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম। লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম জোড়া X এবং Y নামে চিহ্নিত করা হয়।

স্ত্রীলোকের ডিপ্লয়েড কোষে দুটি লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোমই 'X' ক্রোমোজোম, তথা XX। অন্যদিকে পুরুষের ক্ষেত্রে দুটি লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোমের একটি 'X' ক্রোমোজোম এবং অপরটি 'Y' ক্রোমোজোম।

বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকের ডিম্বাশয়ে ডিম্বাণু গঠনের সময় মিয়োসিস কোষ বিভাজনের ফলে প্রতিটি ডিম্বানু অন্যান্য ক্রোমোজোমের সাথে একটি 'X' ক্রোমোজোম লাভ করে। অপরদিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে শুক্রাণু সৃষ্টির সময় অর্ধেক সংখ্যক শুক্রাণু 'Y' ক্রোমোজোম এবং বাকী অর্ধেক সংখ্যক শুক্রণু 'Y' ক্রোমোজোম বহন করে। কিন্তু শুক্রাণু 'X' ক্রোমোজোম বা 'Y' ক্রোমোজোম যেটাই বহন করুক না কেন সে ডিম্বাণুকে নিষিক্ত করতে পারে।

'X' ক্রোমোজোম বহনকারী শুক্রাণু ডিম্বানুকে নিষিক্ত করলে, দুটি 'XX' ক্রোমোজোমের আবির্ভাব ঘটে। অন্যদিকে 'Y' ক্রোমোজোম বহনকারী শুক্রাণু ডিম্বানুকে নিষিক্ত করলে, 'XY' ক্রোমোজোমের আবির্ভাব ঘটে। জাইগোটে লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম জোড় 'XX' হলে, সন্তান হবে কন্যা বা মেয়ে। আর জাইগোটে লিঙ্গ নির্ধারক ক্রোমোজোম জোড় 'XY' হলে, পুত্র সন্তানের জন্ম হবে।

পিতা	মাতা
XY ক্রোমোজোম (ডিপ্লয়েড)	XX ক্রোমোজোম (ডিপ্লয়েড)
জননকোষ/শুক্রাণু X বা Y (হ্যাপ্লয়েড)	ডিম্বাণু/জননকোষ X বা X (হ্যাপ্লয়েড)

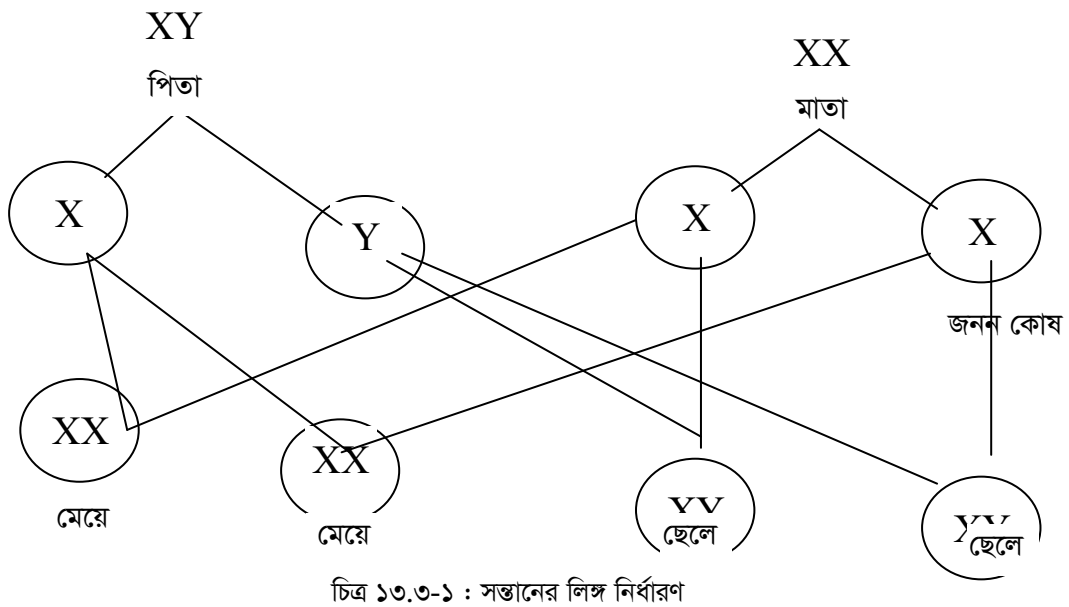

চিত্র ১৩.৩-১ : সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ

আমাদের দেশে কন্যা-সন্তান প্রসব করার কারণে অজ্ঞতাবশত অনেক সময় মাতাকে অপবাদ দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাশিত শিশুর লিঙ্গ নির্ধারণে মাতার কোনো ভূমিকা নেই। কেননা, মাতৃকোষে সবসময়ই কেবলমাত্র 'X' ক্রোমোজোম বহনকারী ডিম্বাণু সৃষ্টি হয়। অপরদিকে পিতার জননকোষ তথা শুক্রাণু 'X' এবং 'Y' ক্রোমোজোমে বহন করে। গর্ভধারণকালে কোনো ধরনের ক্রোমোজোম (X অথবা Y) বহনকারী শুক্রাণু 'X' ক্রোমোজোম বহনকারী ডিম্বানুর সাথে মিলিত হবে, তার উপর নির্ভর করে ভবিষ্যত সন্তানের লিঙ্গ। যদি পিতার 'X' ক্রোমোজোম বহনকারী শুক্রাণু মাতার 'X' ক্রোমোজোম বহনকারী ডিম্বানুকে নিষিক্ত করে, তবে উৎপন্ন জাইগোট হবে 'XX' তথা সন্তান হবে কন্যা। অন্যদিকে যদি পিতার 'Y' ক্রোমোজোম বহনকারী শুক্রাণু মাতার 'X' ক্রোমোজোম বহনকারী ডিম্বানুকে নিষিক্ত করে, তবে উৎপন্ন জাইগোট হবে 'XY' তথা ভূমিষ্ট হবে পুত্র সন্তান। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ভূমিষ্ট সন্তান ছেলে অথবা না মেয়ে হবে, এরজন্য পিতার কোন প্রকৃতির

ক্রোমোজোম বহনকারী শুক্রাণু মাতার 'X' ক্রোমোজোম বহনকারী ডিম্বানুকে নিষিক্ত করবে তার উপর নির্ভর করবে সন্তান ছেলে অথবা মেয়ে হবে। সুতরাং সন্তান ছেলে অথবা মেয়ে হওয়ার জন্য মাতা নয় পিতা দায়ী।

সারসংক্ষেপ

- নিউক্লিওপ্লাজমের মধ্যে লম্বা সূক্ষ্ম সুতার ন্যায় যে বস্তু দেখা যায়, একে ক্রোমোজোম বলে।
- অসংখ্য জীন ক্রোমোজোমে বিন্যাস থাকে। ক্রোমোজোম বংশগতির ধারক ও বাহক।
- মানবদেহের প্রতিটি কোষে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে।
- ডিম্বাণু কেবলমাত্র X ক্রোমোজোম বহন করে। কিন্তু শুক্রাণু 'X' বা 'Y' ক্রোমোজোম বহন করে।
- সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে পিতাই দায়ী মাতা নহে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মানবদেহের দেহকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা কত?

(ক) ২১ জোড়া (খ) ২২ জোড়া (গ) ২৩ জোড়া (ঘ) ২৪ জোড়া।

২। মানবদেহের জননকোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা কত?

(ক) ২২ জোড়া (খ) ২২টি (গ) ২৩জোড়া (ঘ) ২৩টি।

৩। নিচের কোনটি দ্বারা হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যাকে নির্দেশ করে?

(ক) n (খ) 2n (গ) 3n (ঘ) 4n

৪। ছেলে সন্তান জন্মের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) XX (খ) XY (গ) XXX (ঘ) XXXX.

পাঠ ১৩.৪

উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষ; কোষের রূপান্তর

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উদ্ভিদ ও প্রাণি কোষের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন;
- কোষের রূপান্তর সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষ

উদ্ভিদ দেহের যে কোনো অংশ থেকে খুব পাতলা একটি প্রস্থচ্ছেদ নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পর্যবেক্ষণ করলে অসংখ্য ছোট ছোট কুঠুরি দেখা যাবে এ সমস্ত কুঠুরিগুলোর প্রত্যেকটি এক একটি কোষ। উদ্ভিদ কোষের ন্যায় প্রাণি দেহের কোনো কোষ নিয়ে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে পর্যবেক্ষণ করলে প্রাণিকোষ সম্পর্কে ও ধারণা পাওয়া যাবে।

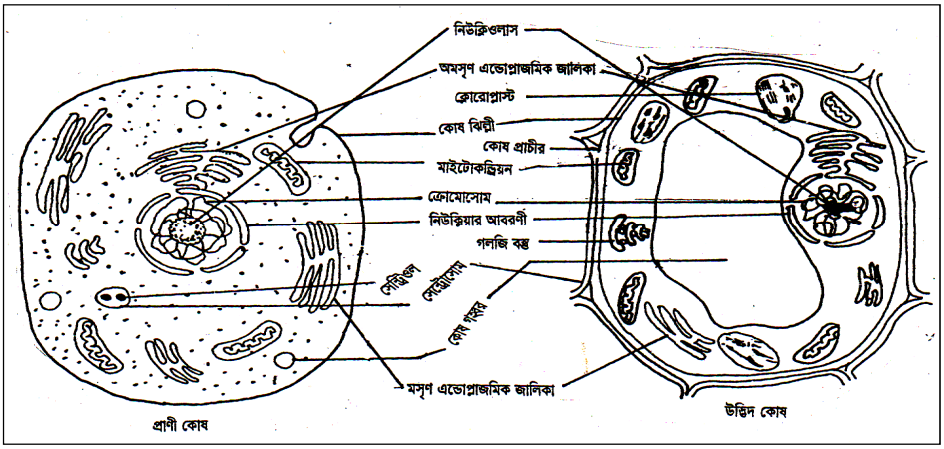

চিত্র ১৩.৪-১ : উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষ (ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট)

উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের মধ্যে পার্থক্য

নিচে ছক আকারে (ছক ১৩.৪-১) উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের মধ্যে পার্থক্য আলোচনা করা হলো–

আলোচনার বিষয়	উদ্ভিদ কোষ	প্রাণিকোষ
কোষ প্রাচীর	উদ্ভিদ কোষের চারিদিকে সেলুলোজ নির্মিত জড় কোষ প্রাচীর বিদ্যমান।	প্রাণিকোষে কোনো কোষ প্রাচীর নেই। পাতলা স্থিতিস্থাপক প্লাজমাঝিল্লি দ্বারা প্রাণিকোষ আবৃত থাকে।
প্লাস্টিড	কিছু নিম্ন শ্রেণীর উদ্ভিদ (যেমন– ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি) ব্যতীত অধিকাংশ উদ্ভিদ কোষে প্লাস্টিড থাকে।	প্রাণিকোষে সাধারণত প্লাস্টিড থাকে না।
সেন্ট্রোজোম	উদ্ভিদ কোষে কোনো সেন্ট্রোজোম নেই (ব্যতিক্রম, কিছু শৈবাল, মস ও ছত্রাক)।	প্রাণিকোষ সেন্ট্রোজোম সর্বদা বিদ্যমান।
কোষ গহ্বর	উদ্ভিদ কোষে সাধারণত বড় আকারের এক বা একাধিক কোষ গহ্বর থাকে।	প্রাণিকোষে সাধারণত কোনো কোষ গহ্বর থাকে না। থাকলেও আকারে ক্ষুদ্রাকৃতির হয়ে থাকে।

আলোচনার বিষয়	উদ্ভিদ কোষ	প্রাণিকোষ
আকার	পূর্ণাঙ্গ উদ্ভিদকোষের আকার সাধারণত পরিবর্তিত হয় না।	পূর্ণাঙ্গ প্রাণিকোষের আকার পরিবর্তিত হতে পারে।
মাইক্রোভিলাই	প্লাজমা পর্দায় মাইক্রোভিলাই নেই।	প্লাজমা পর্দায় মাইক্রোভিলাই উপস্থিত।
নিউক্লিয়াসের অবস্থান	নিউক্লিয়াস সাধারণত কোষের পরিধির দিকে অবস্থান করে।	নিউক্লিয়াস সাধারণত কোষের কেন্দ্রস্থলে অবস্থান করে।
সঞ্চিত খাদ্য	উদ্ভিদকোষের সঞ্চিত খাদ্য সাধারণত শ্বেতসার।	প্রাণিকোষের সঞ্চিত খাদ্য গ্লাইকোজেন।
লাইসোজোম	শুধুমাত্র ভাজক কোষেই লাইসোজোম থাকে।	সকল কোষেই লাইসোজোম থাকে।
স্নেহদ্রব্য	স্নেহদ্রব্য তরল অবস্থায় থাকে।	স্নেহদ্রব্য অর্ধতরল অবস্থায় থাকে।

ছক ১৩.৪-১ : উদ্ভিদ ও প্রাণিকোষের পার্থক্য

কোষের রূপান্তর

পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রতিটি জীবই শুরুতে এক কোষবিশিষ্ট ছিল, কেননা জীবের প্রাথমিক কোষ তথা জাইগোট (নিষিক্ত ডিম্বানু) এককোষী। এককোষী জীব (যেমন– ব্যাকটেরিয়া, প্লাজমোডিয়াম, অ্যামিবা প্রভৃতি) ছাড়া প্রতিটি জীব তথা বহুকোষী উদ্ভিদ ও প্রাণি, এই এককোষী অবস্থা থেকে জীবন শুরু করে। পরে পর্যায়ক্রমে এবং বারবার উক্ত কোষের বিভাজনের মাধ্যমে এবং নতুন সৃষ্ট কোষগুলোর পরিবর্ধনের মাধ্যমে বহুকোষী জটিল, বিভিন্ন আকার, আকৃতিবিশিষ্ট দেহের অধিকারী হয়ে থাকে। জীবদেহের এ বৃদ্ধি কোষের বার বার বিভাজনের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এভাবে বিভাজনের ফলে জীবদেহের অসংখ্য কোষের সৃষ্টি হওয়াই পরে এদের মধ্যে বিভিন্ন কাজের জন্য শ্রম বণ্টনের প্রয়োজন পড়ে। তার ফলে জীবের বিভিন্ন ধরনের কাজের উপযোগিতার জন্য কোষগুলোর মধ্যে রূপান্তর ঘটে। এভাবে সৃষ্টি হয় টিস্যু ও টিস্যুতন্ত্র, অঙ্গ ও অঙ্গতন্ত্র ইত্যাদি।

বহুকোষী জীবে কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক কোষ থাকে অর্থাৎ জীবদেহের বিভিন্ন কাজ করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কোষগুচ্ছের উপস্থিতি বিদ্যমান। এমনিভাবে সৃষ্টি হয় টিস্যুর। একই প্রকার ও একই আকার-আকৃতি বিশিষ্ট একগুচ্ছ কোষ যখন একই কাজ সম্পন্ন করে তখন তাদেরকে টিস্যু বলে। এমনিভাবে টিস্যুর সমন্বয়ের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় টিস্যুতন্ত্র। টিস্যুতন্ত্র থেকে অঙ্গ এবং অঙ্গ সমন্বয়ের মাধ্যমে অঙ্গতন্ত্র।

কাজেই দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন কোষগুচ্ছ তাদের ভিন্ন ভিন্ন কার্যকারিতার পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ জীবের সার্বিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে থাকে। এভাবে প্রতিটি জীব তার নিজ নিজ কাজ সম্পন্ন করতে পারে এবং খাদ্যগ্রহণ, দৈহিক বৃদ্ধি ও প্রজনন তথা বংশবৃদ্ধিতে সক্ষম হয়।

কোষের এ রূপান্তরকে নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপন করা যেতে পারে।

কোষগুচ্ছ দ্ব টিস্যু দ্বটিস্যুতন্ত্র দ্বঅঙ্গ দ্বঅঙ্গতন্ত্র দ্বপূর্ণাঙ্গ জীব।

সারসংক্ষেপ

- বিশেষভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের মধ্যে বহুল অংশে মিল রয়েছে।
- উদ্ভিদকোষ জড় কোষপ্রাচীর দ্বারা আবৃত থাকে কিন্তু প্রাণিকোষ জড় কোষপ্রাচীরের পরিবর্তে স্থিতিস্থাপক পাতলা পর্দা বা ঝিল্লি দ্বারা আবৃত থাকে, একে প্লাজমা ঝিল্লি বা প্লাজমা মেমব্রেন বলে।
- বহুকোষী জীবে অসংখ্য কোষের কার্যকারিতা পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে জীবের পূর্ণাঙ্গ কার্যকারিতা প্রকাশ পায়।
- কোষ থেকে টিস্যু, টিস্যু থেকে টিস্যুতন্ত্র, টিস্যুতন্ত্র থেকে অঙ্গ এবং অঙ্গ থেকে অঙ্গতন্ত্রের সৃষ্টি এবং পরিশেষে অঙ্গতন্ত্র থেকে পূর্ণাঙ্গ জীবের সৃষ্টি হয় ও সকল জৈবিক কার্যাবলি প্রকাশ পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. নিচের কোনটি উদ্ভিদ কোষে অনুপস্থিত?

(ক) ক্লোরোপ্লাস্ট (খ) সেন্ট্রোজোম (গ) কোষ গহ্বর (ঘ) কোষপ্রাচীর।

২. নিচের কোনটি প্রাণিকোষে বিদ্যমান?

(ক) কোষ প্রাচীর (খ) প্লাস্টিড (গ) ক্লোরোপ্লাস্ট (ঘ) কোষ ঝিল্লি।

৩. একই প্রকার, একই কার্যক্ষমতা সম্পন্ন কোষগুচ্ছকে কি বলে?

(ক) টিস্যু (খ) টিস্যুতন্ত্র (গ) অঙ্গ (ঘ) অঙ্গতন্ত্র।

পাঠ ১৩.৫

টিস্যু, টিস্যুতন্ত্র, অঙ্গ, অঙ্গতন্ত্র ও জীবদেহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- টিস্যুর সংজ্ঞা লিখতে পারবেন;
- টিস্যুর প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন;
- টিস্যুতন্ত্র কি তা আলোচনা করতে পারবেন;
- অঙ্গ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- অঙ্গতন্ত্র কি তা বলতে পারবেন;
- জীবদেহের গঠন সম্পর্কে সম্যক ধারণা দিতে পারবেন।

টিস্যু

প্রতিটি বহুকোষী উন্নত জীবদেহ বিভিন্ন আকৃতির অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত। এসব কোষের কাজও ভিন্ন ধরনের। কাজের বিভিন্নতার জন্যই কোষগুলো পরিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে। তবে একই আকার ও আকৃতির কিছু কোষ গুচ্ছবদ্ধ হলে তাদের মধ্যে শ্রমবিভাগ শুরু হয়। এদের উৎসও এক। এ গুচ্ছবদ্ধ কোষগুলোকে টিস্যু বলে। অর্থাৎ অবিচ্ছিন্ন ও সুসংগঠিত একগুচ্ছ কোষ যাদের উৎপত্তি এবং প্রধান প্রধান কাজ একই প্রকার সেই কোষগুচ্ছকে টিস্যু বলে। কাজেই টিস্যু বলতে আমরা এমন একগুচ্ছ কোষকে বুঝি যে কোষগুলো একই স্থান থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে এবং সংঘবদ্ধভাবে অবস্থান করে একই কাজ সম্পন্ন করে।

টিস্যুর প্রকারভেদ

বহুকোষী উদ্ভিদে কাজের বিভিন্নতা ও বিভাজন ক্ষমতা অনুসারে টিস্যু দুই প্রকার। যথা– ভাজক টিস্যু ও স্থায়ী টিস্যু।

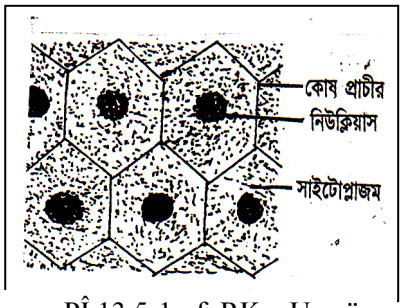

wPÎ 13.5-1 : fvRK wUmy¨

ভাজক টিস্যু : বিভাজনে সক্ষম কোষ দিয়ে গঠিত টিস্যুকেই ভাজক টিস্যু বলা হয়। ভাজক টিস্যুর কোষগুলোকে ভাজক কোষ বলে। ভাজক কোষের বিভাজনের মাধ্যমেই উদ্ভিদের দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে থাকে এবং ভাজক টিস্যু হতেই অন্যান্য স্থায়ী টিস্যুর উৎপন্ন হয়। ভাজক কোষগুলো ডিম্বাকার বা আয়তাকার ও বড় বড় নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট হয়। ভাজক কোষে সাধারণত কোষগহ্বর থাকে না।

উদ্ভিদের মূলের অগ্রভাগে এবং কান্ডের শীর্ষে (মুকুলে) সাধারণত ভাজক টিস্যু থাকে, ফলে উদ্ভিদের মূল ও কান্ডের দৈর্ঘ্যে বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া উদ্ভিদের অন্তঃত্বকে ক্যাম্বিয়াম নামক এক ধরনের ভাজক টিস্যু থাকে। এটি জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুর মধ্যে বৃত্তাকারে অবস্থান করে। এটি একস্তর বিশিষ্ট প্যারেনকাইমা কোষ দ্বারা গঠিত। এ ক্যাম্বিয়াম টিস্যুর বিভাজনের মাধ্যমে বাইরের দিকে নতুন ফ্লোয়েম টিস্যু এবং ভিতরের দিকে নতুন জাইলেম টিস্যুর সৃষ্টি হয়। এভাবে গাছের কান্ড পাশে বা প্রস্থে বাড়ে। উদ্ভিদের এ ধরনের বৃদ্ধিকে গৌণ বৃদ্ধি (Secondary growth) বলে।

স্থায়ী টিস্যু : ভাজক টিস্যু থেকে উৎপন্ন যে টিস্যুগুলো বিভাজনে অক্ষম তাদেরকে স্থায়ী টিস্যু বলে। ভাজক টিস্যুগুলো বিভাজন ক্ষমতা লোপ পাওয়ার পর তা বৃদ্ধি পেয়ে একটি নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত

হয়ে স্থায়ী টিস্যুতে পরিণত হয়। স্থায়ী টিস্যু প্রধানত তিন প্রকার। যথা– সরল টিস্যু, জটিল টিস্যু ও ক্ষরণকারী টিস্যু।

সরল টিস্যু : যে স্থায়ী টিস্যুর কোষগুলো আকার, আকৃতি ও গঠন বৈশিষ্ট্যে একই ধরনের হয় তাকে সরল টিস্যু বলে। কোষের আকৃতি ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে সরল টিস্যুকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে যথা– প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমা।

প্যারেনকাইমা : এ টিস্যুর কোষগুলো জীবিত। এরা দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও গভীরতায় মোটামুটিভাবে একই রকম হয় এবং দেখতে গোলাকার, ডিম্বাকার বা কখনও বহুভূজাকার হয়। এদের কোষ প্রাচীর সাধারণত পাতলা এবং সমান পুরু হয়। এ টিস্যুর কোষগুলোর মাঝে আন্তঃকোষীয় ফাঁক থাকতে পারে। কোষে বড় আকৃতির নিউক্লিয়াস থাকে। এছাড়া কোষে প্রোটোপ্লাজমের পরিমাণ এবং গহ্বরের সংখ্যা বেশি। উদ্ভিদের মূল, কান্ড ও পাতার নরম অংশ এ টিস্যু দিয়ে তৈরি।

কোলেনকাইমা : কোলেনকাইমা টিস্যুর কোষগুলো কিছুটা লম্বাকৃতির ও সজীব। কোষে প্রোটোপ্লাজম থাকে। এদের কোষপ্রাচীর অসমভাবে পুরু, কোষ প্রাচীরের কোণে পেকটিন জমা হওয়ায় ঐ স্থান অধিক মোটা হয়। সাধারণ পত্রবৃন্ত, পাতার শিরা ও ফুলের বোঁটা কোলেনকাইমা দিয়ে গঠিত।

স্ক্লেরেনকাইমা : এ টিস্যুর কোষগুলো লম্বাকৃতির এবং এদের প্রান্তদ্বয় সরু। কোষগুলোর প্রাচীর বেশ পুরু এবং সমান পুরুত্ব বিশিষ্ট। কোষপ্রাচীরের গাত্রে লিগনিন জমা হয়ে এমন পুরু হয়, অনেক সময় ভিতরের ছিদ্র ও বন্ধ হয়ে যায়। এ ধরনের কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজম থাকে না বললেই চলে।

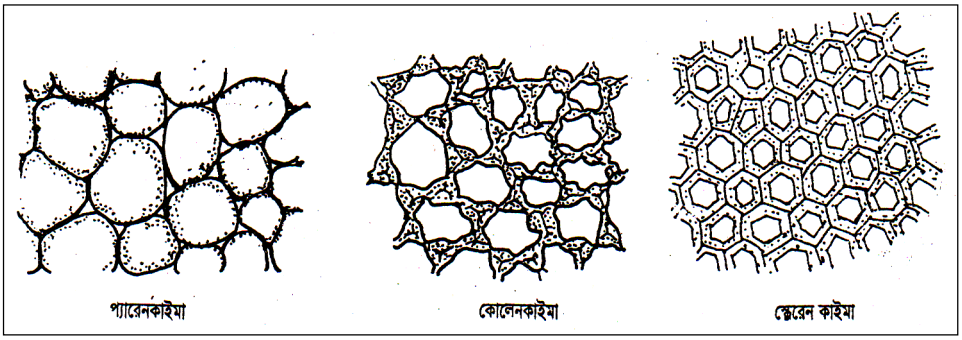

চিত্র ১৩.৫-২ : বিভিন্ন প্রকার সরল টিস্যু

পরিপক্ক অবস্থায় এ কোষগুলো মৃত এবং প্রোটোপ্লাস্টবিহীন। উদ্ভিদের ত্বকের নিচে পরিবহন টিস্যু গুচ্ছের চারপাশে স্ক্লেরেনকাইমা থাকে। উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গকে দৃঢ়তা প্রদান করাই এ টিস্যুর প্রধান কাজ।

জটিল টিস্যু : যে স্থায়ী টিস্যু একাধিক প্রকার কোষ দিয়ে গঠিত তাকে জটিল টিস্যু বলে। উদ্ভিদ দেহে এরা পরিবহন টিস্যু তৈরি করে। জটিল টিস্যু প্রধানত দু'প্রকার। যথা– জাইলেম টিস্যু ও ফ্লোয়েম টিস্যু।

জাইলেম টিস্যু : যে টিস্যুর মাধ্যমে মাটি থেকে পানি ও খনিজ লবণ উদ্ভিদের বায়বীয় অংশে পরিবাহিত হয়, তাকে জাইলেম টিস্যু বলে। জাইলেম টিস্যু উদ্ভিদের দৃঢ়তা প্রদানকারী অন্যতম প্রধান অংশ। এ টিস্যু প্রধানত চারটি ভিন্ন প্রকার টিস্যু নিয়ে গঠিত, যথা– ট্রাকিড, ভেসেল বা ট্রাকিয়া, জাইলেম ফাইবার ও জাইলেম প্যারেনকাইমা।

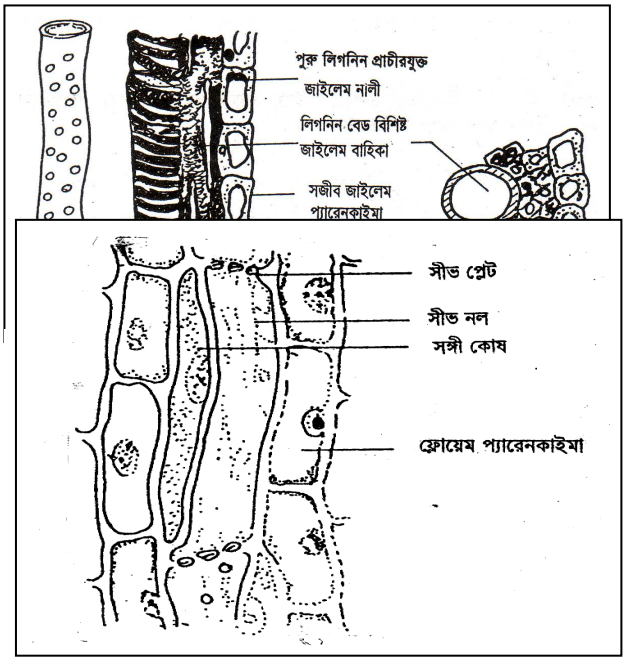

ফ্লোয়েম টিস্যু : যে টিস্যুর মাধ্যমে উদ্ভিদের পাতায় তৈরি জৈব খাদ্য উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয়, তাকে ফ্লোয়েম টিস্যু বলে। ফ্লোয়েম হলো সজীব টিস্যু। জাইলেম ও ফ্লোয়েম একত্রে মিলে পরিবহন টিস্যুগুচ্ছ তথা ভাস্কুলার বান্ডল গঠন করে। এ টিস্যুর কোষগুলো বিভিন্ন আকৃতির ও ভিন্ন গঠনযুক্ত হয়েও নির্দিষ্ট কাজে লিপ্ত থাকে। ফ্লোয়েম টিস্যুর উপাদানগুলো হলো– সীভনল, সঙ্গীকোষ, ফ্লোয়েম প্যারেনকাইমা ও ফ্লোয়েম ফাইবার।

ক্ষরণকারী টিস্যু : যে টিস্যু থেকে নানা প্রকার তরল পদার্থ (উৎসেচক, বর্জ্য ইত্যাদি) নিঃসৃত হয়ে থাকে, তাকে ক্ষরণকারী টিস্যু বলে। ক্ষরণকারী টিস্যু দু'প্রকার। যথা– তরুক্ষীর টিস্যু ও গ্রন্থি টিস্যু।

তরুক্ষীর টিস্যু : যে টিস্যু হতে তরুক্ষীর নিঃসৃত হয়ে থাকে, তাকে তরুক্ষীর টিস্যু বলে। তরুক্ষীর এক প্রকার সাদা, হলুদ বা বর্ণহীন তরল পদার্থ।

চিত্র ১৩.৫-৪ : ফ্লোয়েম টিস্যু

গ্রন্থি টিস্যু : গ্রন্থি টিস্যু এককোষী বা বহুকোষী হতে পারে। উৎসেচক, মধু, আঠা, রজন, তেল প্রভৃতি পদার্থ এ গ্রন্থিতে জমা থাকে।

টিস্যুতন্ত্র

একই ধরনের কাজ করে এমন কতগুলো টিস্যু মিলে একটি টিস্যুতন্ত্র গঠন করে। যেমন– জাইলেম ও ফ্লোয়েম টিস্যুর সমন্বয়ে গঠিত হয় পরিবহন টিস্যুতন্ত্র।

টিস্যুর অবস্থান ও কাজের উপর নির্ভর করে উদ্ভিদের সব টিস্যুকে তিনটি টিস্যুতন্ত্রে ভাগ করা যায়। যথা–

- এপিডার্মাল টিস্যুতন্ত্র
- গ্রাউন্ড টিস্যুতন্ত্র
- ভাস্কুলার টিস্যুতন্ত্র।

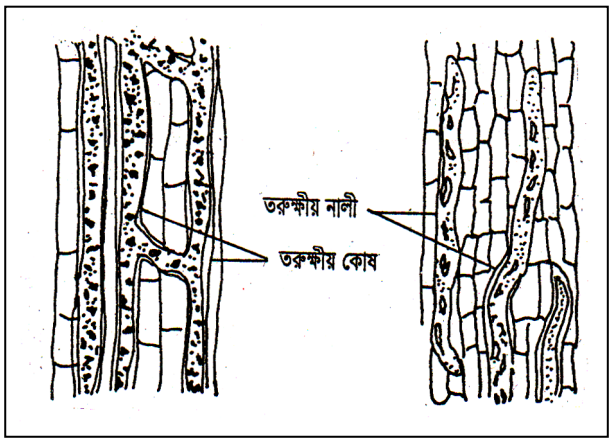

চিত্র ১৩.৫-৫ : ক্ষরণকারী টিস্যুর বিভিন্ন কোষ

অঙ্গ

কতকগুলো টিস্যু বা টিস্যুতন্ত্র একত্রিত হয়ে একই ধরনের কাজ সম্পাদনের জন্যে গঠিত অংশকে অঙ্গ বলে। যেমন– উদ্ভিদের মূল, কান্ড, পাতা ইত্যাদি।

অঙ্গ তন্ত্র

একাধিক অঙ্গ মিলিত হয়ে একই ধরনের কাজ সম্পন্ন করলে তাকে বলা হয় অঙ্গতন্ত্র। যেমন– শ্বসন কাজ পরিচালনার জন্য শ্বাসনালী, ফুসফুস ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত হয় প্রাণির শ্বাসতন্ত্র। এছাড়া আছে রেচন তন্ত্র, পরিপাক তন্ত্র, রক্তসংবহন তন্ত্র, প্রজনন তন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র ইত্যাদি।

জীবদেহ

একাধিক অঙ্গ বা অঙ্গতন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত হয় একটি উন্নত বা জটিল জীবদেহ। যেমন– মূল, কান্ড ও পাতার সমন্বয়ে একটি উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। তেমনিভাবে হাত, পা, মাথা, মুখমন্ডল, বুক, শ্বাসতন্ত্র, রেচনতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্র, প্রজনন তন্ত্র, রক্তসংবহন তন্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে সৃষ্টি হয় একটি পূর্ণাঙ্গ মানবদেহ।

সারসংক্ষেপ

- অবিচ্ছিন্ন ও সুসংগঠিত একগুচ্ছ কোষ যাদের উৎপত্তি এবং প্রধান প্রধান কাজ একই প্রকার সেই কোষগুচ্ছকে টিস্যু বলে।
- বিভাজন ক্ষমতা ও কাজের বিভিন্নতা অনুসারে টিস্যু দুই প্রকার। যথা– ভাজক টিস্যু ও স্থায়ী টিস্যু।
- স্থায়ী টিস্যু তিন প্রকার। যথা– সরল টিস্যু, জটিল টিস্যু ও ক্ষরণকারী টিস্যু।
- সরল টিস্যু তিন প্রকার। যথা– প্যারেনকাইমা, কোলেনকাইমা ও স্ক্লেরেনকাইমা।
- জটিল টিস্যু দুই প্রকার। যথা– জাইলেম টিস্যু ও ফ্লোয়েম টিস্যু।
- একগুচ্ছ কোষ থেকে সৃষ্টি হয় টিস্যু, টিস্যু থেকে উৎপন্ন টিস্যুতন্ত্র, টিস্যুতন্ত্র থেকে অঙ্গ, অঙ্গ থেকে অঙ্গতন্ত্র এবং পরিশেষে বিভিন্ন অঙ্গতন্ত্রের মাধ্যমে উৎপত্তি হয় উন্নততর জটিল জীবদেহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. কোন টিস্যু উদ্ভিদের বৃদ্ধির জন্য দায়ী?
(ক) জটিল টিস্যু (খ) ভাজক টিস্যু (গ) সরল টিস্যু (ঘ) ক্ষরণকারী টিস্যু।

২. মূল ও কান্ডের প্রস্থ বৃদ্ধি করে কোন টিস্যু?
(ক) শীর্ষভাজক টিস্যু (খ) প্রাইমারি টিস্যু (গ) প্যারেনকাইমা টিস্যু (ঘ) সেকেন্ডারী টিস্যু।

৩. উদ্ভিদের দৃঢ়তা প্রদানকারী টিস্যুর নাম কি?
(ক) স্ক্লেরেনকাইমা (খ) প্যারেনকাইমা (গ) কোলেনকাইমা (ঘ) ভাজক টিস্যু।

৪. নিচের কোনটি জাইলেমের উপাদান নহে?
(ক) ট্রাকিড (খ) ভেসেল (গ) সঙ্গীকোষ (ঘ) জাইলেম প্যারেনকাইমা।

৫. সরল টিস্যু কত প্রকার?
(ক) এক প্রকার (খ) তিন প্রকার (গ) দুই প্রকার (ঘ) চার প্রকার।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি

১. কোষ কাকে বলে? অবস্থান ও কাজ অনুযায়ী কোষ কত প্রকার ও কি কি?

২. কোষ প্রাচীর ও কোষ ঝিল্লী কি?

৩. মাইটোকন্ড্রিয়াকে কেন কোষের শক্তিঘর বলা হয়?

৪. প্লাস্টিড কি? কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকার প্লাস্টিডের বর্ণনা দিন।

৫. নিউক্লিয়াস কি? চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৬. সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণে ক্রোমোজোমের ভূমিকা আলোচনা করুন।

৭. উদ্ভিদকোষ ও প্রাণিকোষের মধ্যে পার্থক্যগুলো লিখুন।

৮. টিস্যু কাকে বলে? কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন–১ :	১. খ	২. ক	৩. ঘ	৪. গ	৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন–২ :	১. গ	২. ঘ	৩. ক	৪. খ	৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৩ :	১. গ	২. ঘ	৩. ক	৪. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৪ :	১. খ	২. ঘ	৩. ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন–৫ :	১. খ	২. ঘ	৩. ক	৪. গ	৫. খ।